সূরাঃ ৩৩ নং আল-আহযাব ٱلْأَحْزَاب

আয়াত সংখ্যাঃ৭৩। মাদানী সূরা, রুকুঃ ৯

ভূমিকা

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sisters'Forum In Islam.com

নামকরণ:

"আল-আহযাব" (الأحزاب) অর্থ বিভিন্ন জোট, দল বা সম্মিলিত বাহিনী। ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্র মিলে মদিনা আক্রমণের জন্য যে মহাজোট গঠন করেছিল, সেই যুদ্ধের ঘটনা এবং সূরার ২০ নম্বর আয়াতে يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا 'আহযাব' শব্দটি আসার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহোদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োজিত তীরন্দাজদের ভুলে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। এ কারণে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদি ও মুনাফিকদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মনে আসা জেগেছিল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে। ওহোদের পরে প্রথম বছরে যেসব ঘটনা ঘটে তা থেকেই তাদের এ ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য আন্দাজ করা যেতে পারে।

ওহোদ যুদ্ধের পরে দু' মাসও অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় দেখা গেলো যে, নজদের বনী আসাদ গোত্র মদীনা তাইয়েবার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু সালামার সারীয়া * বাহিনী পাঠাতে হলো।

তারপর ৪ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ গোত্রদ্বয় তাদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দ্বীন ইসলামের শিক্ষা দেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন লোক চায়। নবী (সা.) ছ' জন সাহাবীকে তাদের সংগে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাজী' (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে) নামক স্থানে পৌঁছে তারা হুযাইল গোত্রের কাফেরদেরকে এ নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে তারা হত্যা করে এবং দু' জনকে (হজরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ) নিয়ে মক্কায় শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়। তারপর সেই সফর মাসেই আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো একটি প্রচারক দল পাঠান। এ দলে ছিলেন চল্লিশ জন (অথবা অন্য উক্তি মতে ৭০ জন) আনসারি যুবক। তাঁরা নজদের দিকে রওনা হন। কিন্তু তাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। বনী সুলাইমের 'উসাইয়া, বিল ও যাক্ওয়ান গোত্রত্রয় বিরে মাউনাহ নামক স্থানে অকস্মাত তাঁদেরকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় মদীনার বনী নাযীর ইহুদি গোত্রটি সাহসী হয়ে ওঠে এবং একের

পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে থাকে। এমনকি চার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তারপর ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাত্‌ফানের দু' টি গোত্র বনু সা' লাবাহ্ ও বনু মাহারিব মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। তাদের গতিরোধ করার জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবে ওহোদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও প্রতাপে যে ধস নামে, ক্রমাগত সাত আট মাস ধরে তার আত্মপ্রকাশ হতে থাকে।

*সীরাতের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন সামরিক অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীক ছিলেন না। আর "গাযওয়া" বলা হয় এমন যুদ্ধ বা সমর অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতা এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গের প্রেরণাই মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থার গতি পাল্টে দেয়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীদের জন্য জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল। আশেপাশের সকল মুশরিক গোত্র হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছিল। মদীনার মধ্যেই ইহুদী ও মুশরিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সাচ্চা মু' মিন গোষ্ঠী আল্লাহর রসূলের নেতৃত্বে একের পর এক এমন সব পদক্ষেপ নেয় যার ফলে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়ে যায়নি বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

আহ্‌যাব যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধগুলো

এর মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের পরপরই যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় সেগুলোই ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ। যুদ্ধের পরে ঠিক দ্বিতীয় দিনেই যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল আহত, বহু গৃহে নিকটতম আত্মীয়দের শাহাদাত বরণে হাহাকার চলছিল এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আহত ছিলেন এবং তাঁর চাচা হাম্‌যার (রা.) শাহাদাত বরণে ছিলেন শোক সন্তপ্ত, তখন তিনি ইসলামের উৎসর্গীত প্রাণ সেনানীদের ডেকে বলেন, আমাদের কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। কারণ মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। নবী করীমের (সা.) এ অনুমান একদম সঠিক ছিল। কাফের কুরাইশরা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া বিজয় থেকে লাভবান না হয়ে খালি হাতে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু পথের মধ্যে কোথাও যখন তারা থেমে যাবে তখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা অনুভব করবে এবং পুনর্বার মদীনা আক্রমণের জন্য দৌঁড়ে আসবে।

হামরাউল আসাদ পৌঁছে মা 'বাদ বিন আবু মা 'বাদ আল-খুযাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি মুসলমান হন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হিতাকাংখী ছিলেন। তাছাড়া বনু হাশেম ও বনু খুযা 'আহর মধ্যে জাহেলী যুগ থেকেই মৈত্রীচুক্তি ছিল। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আবু সুফিয়ানের নিকট গমন করেন। আবু সুফিয়ানের বাহিনী তখন মদীনা থেকে ৬৮ কি. মি. দক্ষিণে 'রাওহা' (الروحاء)-তে অবতরণ করেছে। সে সময় সাথীদের চাপে আবু সুফিয়ান পুনরায় মদীনায় হামলার প্রস্ততি নিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মা 'বাদ সেখানে পৌঁছে যান এবং আবু সুফিয়ানকে রাসূল (ছাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবন বিষয়ে অবহিত করেন। অতঃপর তাকে দারুণভাবে ভীত করে ফেলেন। এমনকি এ কথাও বলেন যে, মুহাম্মাদের বিশাল বাহিনী টিলার পিছনে এসে

গেছে। তোমরা এখুনি পালাও। আবু সুফিয়ান তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতেন না। ফলে তার কথায় বিশ্বাস করে দ্রুত মক্কায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে মা 'বাদকে বলে দিলেন তুমি মুহাম্মাদকে জানিয়ে দিয়ো যে, আমরা অতি সত্বর পুনরায় তাদের উপর হামলা করব এবং তাকে ও তার সাথীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব' । মা 'বাদ রাযী হলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত খবর জানালে মুসলিম বাহিনীর ঈমানী তেজ আরো বেড়ে যায় এবং তারা বলে ওঠেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট' । আর তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক' । এর মাধ্যমে দুই ঈমানী কণ্ঠের মিল হয়ে যায়। (প্রায় আড়াই হাযার বছর পূর্বে) নমরূদের আগুনে নিক্ষেপকালে পিতা ইবরাহীম (আঃ) একই কথা বলেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِىَ فِى النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ- صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) 'হাসবুনাল্লাহ... কথাটি ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। আর একই কথা মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছিলেন যখন লোকেরা তাঁকে বলল যে, শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে। অতএব তাদেরকে তোমরা ভয় কর। একথা তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে ওঠে হাসবুনাল্লাহ 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি কতইনা সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক' । বুখারী হা/৪৫৬৩; ইবনু হিশাম ২/১০৩। বস্ত্ততঃ সকল যুগের ঈমানদারগণ চূড়ান্ত বিপদে সর্বদা একই কথা বলে থাকেন।

এজন্য রাসূল সা তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সংগে সংগেই ৬৩০ জন উৎসর্গীত প্রাণ সাথী তাঁর সংগে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। মক্কার পথে হাম্‌রাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। সেখানে একজন অমুসলিম শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন সহযোগীকে নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে দওরুর রওহা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তারা যথার্থই নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (স) একটি সেনাদল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছেন একথা শুনে তাদের সব সাহস উবে যায়। এ কার্যক্রমের ফলে কুরাইশরা আগে বেড়ে যে হিম্মত দেখাতে চাচ্ছিল তা ভেঙে পড়ে, এর ফায়দা স্রেফ এতটুকুই হয়নি বরং আশপাশের দুশমনরাও জানতে পারে যে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করছেন এক সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর ইঙ্গিতে মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। আয়েশা (রাঃ) আলে ইমরান ১৭২ আয়াত নাযিলের কারণ হিসাবে ভাগিনা উরওয়া বিন যুবায়েরকে বলেন, তোমার পিতা যুবায়ের ও নানা আবুবকর ঐ দলের মধ্যে ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদের দিন বিপদগ্রস্ত হ' লেন এবং মুশরিকরা ফিরে গেল, তখন তিনি আশংকা করলেন যে, ওরা ফিরে আসতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কারা ওদের পিছু ধাওয়া করবে? অতঃপর তিনি লোকদের মধ্য থেকে সত্তুর জনকে বাছাই করলেন। উরওয়া বলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন, আবুবকর ও যুবায়ের' (বুখারী হা/৪০৭৭)। অর্থাৎ তোমার পিতা ও আমার পিতা। ইবনু কাছীর বলেন, এটি ছিল হামরাউল আসাদ-এর দিন' । আয়াতটি ছিল,

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

"আহত হবার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ-নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। আর যাদেরকে লোকেরা বললোঃ তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা

সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো, তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছেঃ আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী।অবশেষে তারা ফিরে এলো আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ সহকারে। তাদের কোন রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করলো। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী"। আলে ইমরানঃ১৭২-১৭৪

মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই অনুমতি চেয়েও ব্যর্থ হয়। তবে সঙ্গত কারণে রাসূল (ছাঃ) জাবের বিন আব্দুল্লাহকে অনুমতি দেন এবং ৮ মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' (**حَمْرَاء الْأَسَد**) নামক স্থানে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করেন। অতঃপর চারদিন সেখানে অবস্থান শেষে **১২**ই শাওয়াল মদীনায় ফিরে আসেন।

তারপর যখনই বণী আসাদ মদীনার ওপর নৈশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোয়েন্দারা যথাসময়ে তাদের সংকল্পের খবর তাঁর কানে পৌঁছিয়ে দেয়। তাদের আক্রমণ করার আগেই তিনি হযরত আবু সালামার (উম্মুল মু' মিনীন হযরত উম্মে সালামার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড়শো লোকের একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলা করার জন্য পাঠান। এ সেনাদল হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। অসচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এরপর আসে বনী নাযীরের পালা। যেদিন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে এবং সে গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায় সেদিনই তিনি তাদেরকে নোটিশ দিয়ে দেন, দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করো এবং এরপর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে অভয় দিয়ে বলে যে, অবিচল থাকো এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, আমি দু' হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। বনী কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করবে। নজ্দ থেকে বনী গাত্ফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় সাহস পেয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায়, আমরা নিজেদের এলাকা ত্যাগ করবো না, আপনার যা করার করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন, তাদের সহযোগীদের একজনেরও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে অস্ত্র সম্বরণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিন ব্যক্তি একটি উটের পিঠে যে পরিমাণ সম্ভব সহায়-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলে যাবে এবং বাদবাকি সবকিছু মদীনায় রেখে যাবে। এভাবে মদীনার শহরতলীর সমস্ত মহল্লা যেখানে বনী নযীর থাকতো, তাদের সমস্ত বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু মুসলমানদের হাতে চলে আসে। অন্যদিকে এ প্রতিশ্রুতি ভংগকারী গোত্রের লোকেরা খায়বার, আল কুরা উপত্যকা ও সিরিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে।

তারপর তিনি বনী গাত্ফানের দিকে নজর দেন। তারা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল। তিনি চারশো সেনার একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং যাতুর রিকা' নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলেন। এ অতর্কিত হামলায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কোন যুদ্ধ ছাড়াই নিজেদের বাড়িঘর মাল-সামান সবকিছু ফেলে রেখে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এরপর ৪ হিজরীর শাবান মাসে তিনি আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্য বের হয়ে পড়েন। ওহোদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান এ চ্যালেঞ্জ দেয়। যুদ্ধ শেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিলঃ ان موعدكم بدر للعام المقبل (আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার আমাদের ও তোমাদের মোকাবিলা হবে।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দেনঃ نعم ,هى بيننا وبينك موعد (ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হলো)। এ সিদ্ধান্ত আনুসারে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেড় হাজার সাহাবীদের নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু' হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। কিন্তু মার্‌রায্‌ মাহ্‌রান (বর্তমান ফাতিমা উপত্যকা) থেকে সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত হয়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট দিন পর্যন্ত বদরে অপেক্ষা করেন। এ অন্তবর্তীকালে ব্যবসা করে মুসলমানরা বেশ দু' পয়সা কামাতে থাকে। এ ঘটনার ফলে ওহোদে মুসলমানদের যে প্রভাবহানি ঘটে তা আগের চাইতেও আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর ফলে সারা আরবদেশে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুরাইশ গোত্র একা আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

এখন তোমরা জেনে ফেলেছো, সে আসলে শয়তান ছিল, তার বন্ধুদের অনর্থক ভয় দেখাচ্ছিলো। কাজেই আগামীতে তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা যথার্থ ঈমানদার হয়ে থাকো। আলে ইমরানঃ ১৭৫

আর একটি ঘটনা এ প্রভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দূমাতুল জান্‌দাল (বর্তমান আল জওফ) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখান থেকে ইরাক এবং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে আরবের বাণিজ্যিক কাফেলা যাওয়া আসা করতো। এ জায়গার লোকেরা কাফেলাগুলোকে বিপদগ্রস্ত এবং অধিকাংশ সময় লুন্ঠন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজেই সেখানে যান। তারা তাঁর মোকাবিলা করার সাহস করেনি। লোকালয় ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ আরবের সমস্ত এলাকায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতি মনে করতে থাকে মদীনায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির উন্মেষ ঘটেছে তার মোকাবিলা করা এখন আর একটি দু' টি গোত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আহ্‌যাবের যুদ্ধ

'খন্দক' অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে মদীনার প্রবেশপথে দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। 'আহযাব' অর্থ দলসমূহ। মদীনা রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য কুরায়েশদের মিত্র দলসমূহ এক হয়েছিল বিধায় একে 'আহযাবের যুদ্ধ' বলা হয়।

এ অবস্থায় আহ্‌যাব যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এটি ছিল আসলে মদীনার এ শক্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের একটি সম্মিলিত হামলা। এর উদ্যোগ গ্রহণ করে বনী নযীরের মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বরে বসতি স্থাপনকারী নেতারা। তারা বিভিন্ন এলাকা সফর করে কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্যান্য বহু গোত্রকে একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে

তাদের প্রচেষ্টায় ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এক বিরাট বিশাল সম্মিলিত বাহিনী এ ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমণ করে। এতবড় বাহিনী আরবে ইতিপূর্বে আর কখনো একত্র হয়নি। এতে যোগ দেয়-

উত্তর থেকে বনী নযীর ও বনী কাইনুকার ইহুদিরা। এরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বর ও ওয়াদিউল কুরায় বসতি স্থাপন করেছিল।

পূর্ব থেকে যোগ দেয় গাত্‌ফানের গোত্রগুলো (বনু সালীম, ফাযারাহ, মুর্‌রাহা, আশজা' , সা' আদ ও আসাদ ইত্যাদি)।

দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসে কুরাইশ তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী সহকারে। এদের সবার সম্মিলিত সংখ্যা দশ বারো হাজারের কম হবে না।

- আহযাবের যুদ্ধ ৫ হিজরির শাওয়াল মাসে (৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে) মদিনার উপকণ্ঠে সংঘটিত হয়। এটি খন্দকের যুদ্ধ নামেও পরিচিত। মক্কার কুরাইশ ও বিভিন্ন গোত্রের ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ সৈন্যের যৌথ বাহিনী মদিনা আক্রমণ করে। সাহাবি সালমান ফারসির (এই বিষয়টি দূর্বল বর্ননা)পরামর্শে মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করে মুসলিমরা সফলভাবে এই অবরোধ প্রতিহত করেন। অভিজ্ঞ সাহাবাদের পরামর্শে সঠিক মত।

এটা যদি অতর্কিত আক্রমণ হতো তাহলে তা হতো ভয়াবহ ধ্বংসকর। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না। বরং সংবাদদাতারা এবং সমস্ত গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও প্রভাবিত লোকেরা তাঁকে দুশমনদের চলাফেরা ও প্রত্যেকটি গতিবিধি সম্পর্কে সর্বক্ষণ খবরাখবর সরবরাহ করে আসছিলেন।*

এ বিশাল বাহিনী তাঁর শহরে পৌঁছবার আগেই ছ' দিনের মধ্যেই তিনি মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করে ফেলেন এবং সাল্' আ পর্বতকে পেছনে রেখে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ পরিচালনা করতে প্রস্তুত হন। মদীনার দক্ষিণে বাগান ও গাছপালার পরিমাণ ছিল এত বেশী (এবং এখনো আছে) যে, সেদিক থেকে কোন আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা। তার উপর সম্মিলিত সৈন্য পরিচালনা করা কোন সহজ কাজ ছিল না। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের অবস্থাও এ একই ধরনের ছিল। তাই আক্রমণ হতে পারতো একমাত্র ওহোদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণগুলো থেকে। নবী করীম (সা.) এদিকেই পরিখা খনন করে নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন। আসলে মদীনার বাইরে পরিখার মুখোমুখি হতে হবে, এটা কাফেররা ভাবতেই পারেনি। তাদের যুদ্ধের নীল নক্‌শায় আদতে এ জিনিসটি ছিলই না। কারণ আরববাসীরা এ ধরনের প্রতিরক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই সেই শীতকালে তাদেরকে একটি দীর্ঘ স্থায়ী অবরোধের জন্য তৈরি হতে হয়। অথচ এজন্য তারা গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি।

এরপর কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল। তারা ইহুদি গোত্র বনী কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এ গোত্রটির বসতি ছিল মদীনার দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যেহেতু এ গোত্রটির সাথে মুসলমানদের যথারীতি মৈত্রী চুক্তি ছিল এবং এ চুক্তি অনুযায়ী মদীনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হতে বাধ্য, তাই মুসলমানরা এদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে নিজেদের পরিবার ছেলে মেয়েদেরকে বনী কুরাইযার সন্নিহিত এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেদিকে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি।

কাফেররা মুসলমানদের প্রতিরক্ষার এ দুর্বল দিকটি আঁচ করতে পারে। তাদের পক্ষ থেকে বনী নযীরের ইহুদি সরদার হুয়াই ইবনে আখ্‌তাব বনী কুরাইযার কাছে পাঠানো হয়। বনী কুরাইযাকে চুক্তি ভংগ করে দ্রুত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করানোই ছিল তার কাজ। প্রথমদিকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে এমন কোন ব্যবহার করেননি যার ফলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারি। কিন্তু যখন ইবনে আখ্‌তাব তাদেরকে বললো, "দেখো, আমি এখন সারা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছি। একে খতম করে দেবার এটি একটি অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে এরপর আর কোন সুযোগ পাবে না" তখন ইহুদি জাতির চিরাচরিত ইসলাম বৈরী মানসিকতা নৈতিকতার মর্যাদা রক্ষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বনী কুরাইযা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

* জীতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মোকাবিলায় একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের প্রাধান্যের এটি হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা শুধুমাত্র নিজেদের জাতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু একটি আদর্শবাদী ও নীতিবাদী আন্দোলন নিজের দাওয়াতের মাধ্যমে সবদিকে এগিয়ে চলে এবং স্বয়ং ঐ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকেও তার সমর্থক বের করে আনে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন না। তিনি যথা সময়ে এ খবর পেয়ে যান। সংগে সংগেই তিনি আনসার সরদারদেরকে (সা' দ ইবনে উবাদাহ, সা' দ ইবনে মু' আয, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহ ও খাওয়াত ইবনে জুবাইর) ঘটনা তদন্ত করার এবং এ সংগে তাদের বুঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ফিরে এসে সমগ্র সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় এ খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা চুক্তি ভংগ করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইঙ্গিতে এ খবরটি দেবে যাতে এ খবর শুনে সাধারণ মুসলমানরা হিম্মতহারা হয়ে না পড়ে। এ সরদারগণ সেখানে পৌঁছে দেখেন বনি কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাঁদেরকে জানিয়ে দেয় لاعقد بيننا وبين محمد ولا عهد "আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোন অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নেই।" এ জবাব শুনে তারা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে আসেন এবং ইঙ্গিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান عضل وقاره অর্থাৎ 'আদল ও কারাহ ইসলাম প্রচারক দলের সাথে রাজী' নামক স্থানে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বনী কুরাইযা এখন তাই করছে। এ খবরটি অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এখন তারা দু' দিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শহরের যে অংশে তারা কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি সে অংশটি বিপদের সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা সে অংশেই ছিল। এর ফলে মুনাফিকদের তৎপরতা অনেক বেশী বেড়ে যায়। মু' মিনদের উৎসাহ-উদ্যম নিস্তেজ করে দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মনস্তাত্বিক হামলা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, "আমাদের সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে আমরা পেসাব পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি না।" কেউ একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে যে, এখন তো আমাদের গৃহও বিপদাপন্ন, সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে তাদের হাতে তুলে দাও। এটা এমন একটা কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল যার মধ্যে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোস উন্মোচিত হয়ে গেছে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও মুনাফিকি ছিল। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়েও আত্মোৎসর্গের সংকল্পের ওপর অটল থাকে।

এহেন নাজুক সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাতফানদের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা' দ ইবনে উবাদাহ ও সা' দ ইবনে মু' আয) সাথে তিনি চুক্তির এ শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমনটি করবো এটা কি আপনার ইচ্ছা? অথবা এটা আল্লাহর হুকুম, যার ফলে আমাদের এটা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই? না কি নিছক আমাদেরকে বাঁচাবার একটি ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এ প্রস্তাব দিচ্ছেন?" জবাবে তিনি বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাঁচাবার জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। কারণ আমি দেখছি সমগ্র আরব একজোট হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তাদের এক দলকে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই।" একথায় উভয় সরদার এক কন্ঠে বলেন, "যদি আপনি আমাদের জন্য এ চুক্তি করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন। যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখনও এ গোত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও কর হিসেবে আদায় করতে পারেনি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার গৌরবের অধিকারী। এ অবস্থায় তারা কি এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে? আমাদের ও তাদের মাঝখানে এখন আছে শুধুমাত্র তলোয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা না করে দেন।" একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলে দেন, যার ওপর তখনো স্বাক্ষর করা হয়নি।

এ সময় গাতফান গোত্রের আশজা' শাখার না' ঈম ইবনে মাস' উদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তিনি বলেন, এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহনের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোন কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তুত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি গিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো।* একথায় তিনি প্রথমে যান বনী কুরাইযার কাছে। তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল খুব বেশী। তাদেরকে গিয়ে বলেন, কুরাইশ ও গাতফান তো অবরোধে বিরক্ত হয়ে এক সময় ফিরে যেতেও পারে। এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সাথে এখানে বসবাস করতে হবে। তারা চলে গেলে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে অংশ নিয়ো না যতক্ষণ বাইর থেকে আগত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে তোমাদের কাছে যিম্মী হিসেবে না রাখে। একথা বনী কুরাইযার মনে ধরলো। তারা গোত্রসমূহের সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে যিম্মী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তিনি কুরাইশ ও গাতফানের সরদারদের কাছে যান। তাদেরকে বলেন, বনী কুরাইযা কিছুটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে যদি যিম্মী হিসেবে কিছু লোক চায় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং তাদেরকে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে সোপর্দ করে আপোষ রফা করে নিতে পারে। কাজেই তাদের সাথে সতকর্তার সাথে কাজ করা উচিত। এর ফলে সম্মিলিত জোটের লোকেরা বনী কুরাইযার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযার নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠায় যে, দীর্ঘ অবরোধে আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা চাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। আগামীকাল তোমরা ওদিক থেকে আক্রমণ করো, আমরা একই

সংগে এদিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাবো। বনী কোরাইযা জবাবে বলে পাঠায়, আপনারা যতক্ষণ যিম্মী স্বরূপ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমাদের হাওয়ালা করে না দেন ততক্ষণ আমরা যুদ্ধের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি না। এ জবাব শুনে সম্মিলিত জোটের নেতারা না' ঈমের কথা সঠিক ছিল বলে বিশ্বাস করে। তারা যিম্মী দিতে অস্বীকার করে। ফলে বনী কুরাইযা বিশ্বাস করে না' ঈম আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। এভাবে এ যুদ্ধ কৌশল বড়ই সফল প্রমাণিত হয়। এর ফলে শত্রু শিবিরে ফাটল সৃষ্টি হয়।

*এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনالحرب خدعةঅর্থাৎ যুদ্ধে প্রতারণা করা বৈধ।

এখন অবরোধ কাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসুম চলছিল। এত বড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্যদ্রব্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছিল।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, খন্দকের দীর্ঘায়িত যুদ্ধের অসহনীয় কষ্টের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহর নিকট দো 'আ করতে বলেছিলেন,**اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا** 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সংকট দূরীভূত কর এবং আমাদের ভীতি দূর কর' (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০১৮)।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী 'আওফা (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে দো 'আ করে বলেছিলেন,**اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ**

'হে আল্লাহ! হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! সম্মিলিত সেনাদলকে তুমি পরাভূত কর। হে আল্লাহ! তুমি ওদের পরাজিত কর ও ভীত-কম্পিত কর' ।বুখারী হা/২৯৩৩; মুসলিম হা/১৭৪২ (২১); মিশকাত হা/২৪২৬।

নবীগণের বিজয় সাধারণতঃ এরূপ চূড়ান্ত পরীক্ষার পরেই এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

'তোমরা কি ধারণা করেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর এখনও তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' (বাক্বারাহ ২/২১৪)। কুরতুবী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন যে, অত্র আয়াতটি খন্দক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়' (কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)। অতএব এই বিজয় রাসূল (ছাঃ)-এর দো 'আ কবুলের প্রমাণ বৈ কি!

এ অবস্থায় এক রাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধূলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল শৈত, বজ্রপাত ও বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিল এত গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তাঁবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে ওঠে ময়দানে

একজন শত্রুকেও দেখতে পায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দান শত্রুশূন্য দেখে সংগে সংগেই বলেনঃ

لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم

"এরপর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না, এখন তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।" এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ। কেবল কুরাইশ নয়, সমস্ত শত্রু গোত্রগুলো একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের শেষ অস্ত্র হেনেছিল। এতে হেরে যাওয়ার পরে এখন আর তাদের মদীনার ওপর আক্রমণ করার সাধ্য ছিল না। এখন আক্রমণাত্মক শক্তি (Offensive) শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

খন্দক যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি তেমন না হ' লেও এটি ছিল একটি যুগান্তকারী যুদ্ধ। কেননা আরবদের সম্মিলিত বাহিনীর এই ন্যাক্কারজনক পরাজয়ে মদীনার উঠতি মুসলিম শক্তিকে তারা সমগ্র আরবে এক অদমনীয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এতবড় বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করা বিরোধীদের পক্ষে আর কখনো সম্ভব হয়নি। সেদিকে ইঙ্গিত করেই শত্রুদের পলায়নের পর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, اَلْآنَ نَغْزُوْهُمْ وَلاَ يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِلَيْهِمْ 'এখন থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আমরাই ওদের দিকে সৈন্য পরিচালনা করব' । বুখারী হা/৪১১০; মিশকাত হা/৫৮৭৯ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯ 'মু 'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪।

খন্দক যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ

১. ধূলি-ধূসরিত রাসূল (اغبر الرسول صـ) :

খন্দক যুদ্ধে প্রতি ১০ জনের জন্য ৪০ হাত করে পরিখা খননের দায়িত্ব ছিল। ছাহাবী বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় দেখেছি। যাতে তাঁর সারা দেহ বিশেষ করে পেটের চামড়া ধূলি-ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল' (বুখারী হা/৪১০৪)।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে কাজ করেন(إنشاد الرسولـ عند العمل) :

বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, খন্দকের মাটি বহনকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে টান দিয়ে দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলি আবৃত্তি করতে শুনেছি।–

'হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকত, তাহ' লে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হ' তাম না এবং আমরা ছাদাক্বাও দিতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না' । 'অতএব আমাদের উপরে শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মুকাবিলা হয়, তাহ' লে আমাদের পা গুলি দৃঢ় রাখ' । 'নিশ্চয়ই প্রথম পক্ষ আমাদের উপরে বাড়াবাড়ি করেছে। যদি তারা ফিৎনা সৃষ্টি করতে চায়, তাহ' লে আমরা তা অস্বীকার করব ' (বুখারী হা/২৮৩৭)।

৩. কবিতা বলে প্রার্থনার সুরে উৎসাহ দিলেন রাসূল (ছাঃ)(تشجيع الرسول صـ لإنشاد الدعائى) :

ছাহাবী সাহল বিন সা ‘দ (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম ও কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম’। আনাস (রাঃ) বলেন, শীতের সকালে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ছাহাবীগণ পরিখা খনন করছিলেন। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) সেখানে আগমন করেন ও তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে প্রার্থনার সুরে গেয়ে ওঠেন

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَهْ +فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

‘হে আল্লাহ! নেই কোন আরাম পরকালের আরাম ব্যতীত। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর। জবাবে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন,

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا +عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا

‘আমরা তারাই, যারা মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের বায় ‘আত করেছি যতদিন আমরা বেঁচে থাকব’ (বুখারী হা/৪০৯৮-৯৯)।

৪. নেতা ও কর্মী সকলে ক্ষুধার্ত (الأمير والمأمورون كلهم جياع) :

আবু ত্বালহা, জাবের ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকতেন। এমনকি ক্ষুধার যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য তাঁরা পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন’ (ছহীহাহ হা/১৬১৫)।

৫. পরিখা খননকালে মু ‘জিযাসমূহ (ظهور المعجزات عند حفر الخندق) :

(ক) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, খননকালে একটি বড় ও শক্ত পাথর সামনে পড়ে। যা ভাঙ্গা অসম্ভব হয়। রাসূল (ছাঃ)-কে বিষয়টি জানানো হ’লে তিনি এসে তাতে কোদাল দিয়ে আঘাত করলেন, যাতে তা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে বালুর স্তূপের ন্যায় হয়ে গেল, যা হাতে ধরা যায় না। অথচ ঐসময় ক্ষুধার্ত রাসূল (ছাঃ)-এর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। আমরাও তিনদিন যাবৎ অভুক্ত ছিলাম’ (বুখারী হা/৪১০১)।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে ছাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক ছা ‘ (আড়াই কেজি) যব পিষে আটা তৈরী করলেন। অতঃপর রান্না শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে কয়েকজন ছাহাবী সহ গোপনে দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ সময় পরিখা খননরত ১০০০ ছাহাবীর সবাইকে সাথে নিয়ে এলেন। অতঃপর সকলে তৃপ্তির সাথে খাওয়ার পরেও আগের পরিমাণ আটা ও মাংস অবশিষ্ট রয়ে গেল। বুখারী হা/৪১০২; মুসলিম হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৫৮৭৭ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়-২৯, ‘মু ‘জেযা সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।

(গ) ‘আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) পরিখা খনন করছিলেন। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, ‘হে ‘আম্মার! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’ (তিরমিযী হা/৩৮০০)। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, পরিখা খননের সময় রাসূল (ছাঃ) ‘আম্মার-এর মাথার ধূলি ঝেড়ে দিয়ে বলেন, ‘হে সুমাইয়ার পরিশ্রমী সন্তান! তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’ (মুসলিম হা/২৯১৫ (৭০)। উক্ত রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইতিপূর্বে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় অন্যদের ন্যায় মাথায় একটির

বদলে দু’ টি করে ইট বহন করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (ছাঃ) তার মাথার ধূলা ঝেড়ে দেন ও বলেন, তুমি অন্যদের মত না করে এভাবে করছ কেন? জবাবে তিনি বলেন, إِنِّى أُرِيدُ الأَجْرَ مِنَ اللهِ ‘আমি আল্লাহর নিকট থেকে অধিক নেকী কামনা করি’ (আহমাদ হা/১১৮৭৯)। তখন রাসূল (ছাঃ) তার উদ্দেশ্যে বলেন, وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ‘আম্মারের উপর আল্লাহর রহমত হৌক! তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকবে। আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে’। উত্তরে ‘আম্মার বলল, আমি ফিৎনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই’।বুখারী হা/৪৪৭। আরনাঊত্ব বলেন, একই ভবিষ্যদ্বাণী মসজিদে নববী নির্মাণকালে এবং পরবর্তীতে খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন কালে হ’তে পারে (আহমাদ হা/১১০২৪-এর তা‘লীক্ব দ্রঃ)।

ঘ) বারা বিন ‘আযেব (রাঃ) বলেন, আমাদের সামনে বড় একটা পাথর পড়ল। যাতে কোদাল মারলে ফিরে আসতে থাকে। তখন আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে বিষয়টি জানালে তিনি এসে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে পাথরটিতে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। তাতে তার একাংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বলে ওঠেন- আল্লাহু আকবর! আমাকে শামের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এখন তাদের লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি’। অতঃপর দ্বিতীয়বার আঘাত করেন এবং বলে ওঠেন, আল্লাহু আকবর! আমাকে পারস্যের সাম্রাজ্য দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এখন মাদায়েনের শ্বেত-শুভ্র প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তৃতীয়বার ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আঘাত করলেন এবং পাথরটির বাকী অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর! আমাকে ইয়ামন রাজ্যের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এখান থেকে রাজধানী ছান‘আর দরজা সমূহ দেখতে পাচ্ছি’। নাসাঈ হা/৩১৭৬, হাদীছ হাসান; ছহীহাহ হা/৭৭২।বস্তুতঃ এগুলি ছিল ভবিষ্যৎ ইসলামী বিজয়ের অগ্রিম সুসংবাদ মাত্র। যা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৬. মুমিন ও মুনাফিকদের দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া (**تأثران مضادان من المؤمنين** والمنافقين) :

খন্দক যুদ্ধে বিশাল শত্রু সেনাদল দেখে মুনাফিক ও দুর্বলচেতা ভীরু মুসলমানরা বলে ওঠে, রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া ওয়াদা প্রতারণা বৈ কিছু নয়। এমনকি খাযরাজ গোত্রের বনু সালামারও পদস্খলন ঘটতে যাচ্ছিল, যেমন ইতিপূর্বে ওহোদ যুদ্ধের সময় তাদের অবস্থা হয়েছিল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

‘আর মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বৈ কিছু নয়’। ‘তাদের আরেক দল বলল, হে ইয়াছরিববাসীগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল। তাদের মধ্যে আরেক দল নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলল, আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত। অথচ সেগুলি অরক্ষিত ছিল না। মূলতঃ পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য’ (আহযাব ৩৩/১২-১৩)।

অপর পক্ষে মুমিনগণ এটাকে পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন-

'যখন তারা তোমাদের উপর আপতিত হ' ল উচ্চভূমি থেকে ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন (ভয়ে) তোমাদের চক্ষু ছনাবড়া হয়ে গিয়েছিল ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা করতে শুরু করেছিলে' (১০)। 'সে সময় মুমিনগণ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে ভীত-কম্পিত হয়েছিল' (১১)। ...'অতঃপর যখন মুমিনরা শত্রু বাহিনীকে প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বলল, এতো সেটাই, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এমতাবস্থায় তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ' ল' (আহযাব ৩৩/১০-১১, ২২)।

৭. মুসলিম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন (شعار جيش المسلمين) : খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতীক চিহ্ন ছিল,حم- لاَ يُنْصَرُوْنَ হা-মীম। তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' ।ইবনু হিশাম ২/২২৬; যাদুল মা 'আদ ৩/২৪৩; তিরমিযী হা/১৬৮২; আবুদাউদ হা/২৫৯৭, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে ' হা/২৩০৮; মিশকাত হা/৩৯৪৮ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯ অনুচ্ছেদ-৪; মিরক্বাত শরহ ঐ।এটি যেকোন যুদ্ধের জন্য হ' তে পারে।

৮. বর্শা ফেলে পালালেন কুরায়েশ সেনাপতি (فَرَّ قَائِدُ قريش تاركا رمحه) : যুদ্ধ ছাড়াই অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় আবু জাহল পুত্র ও কুরায়েশ বাহিনীর অন্যতম দুর্ধর্ষ সেনাপতি ইকরিমা বিন আবু জাহল দু' জন সাথীকে নিয়ে দুঃসাহসে ভর করে একস্থান দিয়ে খন্দক পার হ' লেন। অমনি হযরত আলীর প্রচন্ড হামলায় তার একজন সাথী নিহত হ' ল। এমতাবস্থায় ইকরিমা ও তার সাথী ভয়ে পালিয়ে আসেন এবং তিনি এতই ভীত হয়ে পড়েন যে, নিজের বর্শাটাও ফেলে আসেন' (আর-রাহীক্ব ৩০৬-০৭ পৃঃ)।

৯. ছালাত ক্বাযা হ' ল যখন (**قضت الصلوات الراتبة**) : খন্দক যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অব্যাহত নযরদারি ও মুকাবিলার কারণে কোন কোন দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। একবার আছরের ছালাত ক্বাযা হয়। যা তারা মাগরিবের পরে প্রথমে আছর অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন' (বুখারী হা/৫৯৬)। এ সময় রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদো 'আ করে বলেন,مَلأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا 'আল্লাহ ওদের বাড়ি ও কবরগুলিকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দিন' ।বুখারী হা/৪১১১, ৪১১২; মুসলিম হা/৬২৭; মিশকাত হা/৬৩৩।

একবার যোহর হ' তে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা হয়' ।মুসলিম, শরহ নববী, হা/৬২৮-এর আলোচনা 'আছরের ছালাতকে 'মধ্যবর্তী ছালাত' বলা হয়' অনুচ্ছেদ, ৫/১৩০। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত ছালাতুল খাওফ-এর বিধান (নিসা ৪/১০১-১০২) নাযিল হয়নি। কেননা উক্ত বিধান নাযিল হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বা 'দ মাসে হোদায়বিয়ার সফর কালে।

১০. খন্দক যুদ্ধের বিষয়ে কুরআন (**القرآن فى غزوة الأحزاب**) :

খন্দক ও বনু কুরায়যার যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহপাক সূরা আহযাবে ৯ থেকে ২৭ পর্যন্ত ১৯টি আয়াত নাযিল করেন। যাতে এই দুই যুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক থেকে গৃহে ফিরে আসার পর যোহরের সময় জিব্রীল (আ) এসে হুকুম শুনালেন, এখনই অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনী কুরাইযার ব্যাপারটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ মুহূর্তেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার।

খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে উম্মে সালামার ঘরে যোহরের সময় যখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) গোসল করছিলেন, তখন জিব্রীল এসে বললেন, আপনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলেছেন, অথচ ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র নামায়নি। দ্রুত তাদের দিকে ধাবিত হউন! রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন দিকে? জবাবে তিনি বনু কুরায়যার দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সেদিকে বেরিয়ে গেলেন’ (বুখারী হা/৪১১৭)। বনু কুরায়যার দুর্গ ছিল মসজিদে নববী থেকে ৬ মাইল বা প্রায় ১০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা প্রচার করে দিলেন, لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ ‘কেউ যেন বনু কুরায়যায় পৌঁছানোর আগে আছর না পড়ে’ (বুখারী হা/৯৪৬)। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের উপরে মদীনার প্রশাসন ভার অর্পণ করে ৩,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি বনু কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, “যে ব্যক্তিই শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর অবিচল আছো সে আসরের নামাজ ততক্ষন পর্যন্ত পড়ো না যতক্ষণ না বনী কুরাইযার আবাসস্থলে পৌঁছে যাও।” এ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি হযরত আলীকে (রা.) একটি ক্ষুদ্র সেনাদলসহ অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে বনী কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন ইহুদিরা নিজেদের গৃহের ছাদে উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গালি বর্ষণ করলো। কিন্তু একেবারে ঠিক যুদ্ধের সময়েই তারা চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলে মদীনার সমগ্র জনবসতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যে মহাঅপরাধ করেছিল তার দণ্ড থেকে এ গালাগালি তাদেরকে কেমন করে বাঁচাতে পারতো? হযরত আলীর ক্ষুদ্র সেনাদল দেখে তারা মনে করেছিল এরা এসেছে নিছক ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে পুরা মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌঁছে গেল এবং তাদের জনবসতি ঘেরাও করে নেয়া হল তখন তাদের হুশ হলো।

দু’ তিন সপ্তাহের বেশী তারা অবরোধের কঠোরতা বরদাশ্‌ত করতে পারলো না। অবশেষে তারা এ শর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করলো যে, আওস গোত্রের সরদার হযরত সা’ দ ইবনে মু’ আয (রা.) তাদের জন্য যা ফায়সালা করবেন উভয় পক্ষ তাই মেনে নেবে। তারা এ আশায় হযরত সা’ দকে শালিস মেনেছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে যে মিত্রতার সম্পর্ক চলে আসছিল তিনি সেদিকে নজর রাখবেন এবং তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেবেন যেমন ইতিপূর্বে বনী কাইনুকা’ ও বনী নযিরকে দেয়া হয়েছিল। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা’ দের কাছে নিজেদের মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করার দাবি করছিল।

কিন্তু হযরত সা’ দ মাত্র এই কিছুদিন আগেই দেখেছিলেন, দু’ টি ইহুদি গোত্রকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং তারা কিভাবে আশপাশের সমস্ত গোত্রকে উত্তেজিত করে দশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপর এ সর্বশেষ ইহুদি গোত্রটি একেবারে ঠিক বহিরাগত

আক্রমণের সময়ই চুক্তিভংগ করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার কি ষড়যন্ত্রটাই না করেছিল সে ঘটনা এখনো তার সামনে তরতাজা ছিল। তাই তিনি ফায়সালা দিলেনঃ বনী কুরাইযার সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করা হোক এবং তাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এ ফায়সালাটি বাস্তবায়িত করা হলো। এরপর মুসলমানরা প্রবেশ করলো বনী কুরাইযার পল্লীতে। সেখানে তারা দেখলো, আহযাব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এ বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীটি ১৫ শত তলোয়ার, ৩ শত বর্ম, ২ হাজার বর্শা এবং ১৫ শত ঢাল গুদামজাত করে রেখেছে। মুসলমানরা যদি আল্লাহর সাহায্য লাভ না করতো তাহলে এ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ঠিক এমন এক সময় পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহার করা হতো যখন সামনে থেকে মুশরিকরা একজোটে খন্দক পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতো। এ বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবার পর এখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই থাকেনি যে, হযরত সা ’ দ ইহুদিদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছিলেন তা সঠিক ছিল।

সামাজিক সংস্কার

ওহোদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝখানের এ দু ’ টি বছর যদিও এমন সংকট এবং গোলযোগে পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহাবীগণ এক দিনের জন্যও নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করতে পারেননি, তারপরও এ সমগ্র সময়-কালে নতুন মুসলিম সমাজ গঠন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল। এ সময়েই মুসলমানদের বিয়ে ও তালাকের আইন প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। উত্তরাধিকার আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছিল। অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বহু দিকে নতুন বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনযোগ্য ছিল দত্তক গ্রহন। আরবের লোকেরা যে শিশুকে দত্তক বা পালিত পুত্র বা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতো তাকে একেবারে তাদের নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের মতো মনে করতো। সে উত্তরাধিকার লাভ করতো। তার সাথে দত্তক মাতা ও বোনেরা ঠিক তেমনি খোলামেলা থাকতো যেমন আপন পুত্র ও ভাইয়ের সাথে থাকা হয়। তার সাথে দত্তক পিতার কন্যার এবং এ পিতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর বিবাহ ঠিক তেমনি অবৈধ মনে করা হতো যেমন সহোদর বোন ও গর্ভধারিনী মায়ের সাথে কারো বিয়ে হারাম হয়ে থাকে। পালক পুত্র মরে যাবার বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার পরও এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দত্তক পিতার জন্য সেই স্ত্রীলোককে তার আপন ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো মনে করা হতো। এ রীতিটি বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকারের যেসব আইন সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসায় আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার সাথে পদে পদে সংঘর্ষশীল ছিল।

আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে যারা উত্তরাধিকারের প্রকৃত হকদার ছিল এ রীতি তাদের অধিকার গ্রাস করে এমন এক ব্যক্তিকে দিতো যার আদতে কোন অধিকারই ছিল না। এ আইনের দৃষ্টিতে যে সমস্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হালাল ছিল এ রীতি তা হারাম করে দিতো। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আইন যেসব নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের পথরোধ করতে চায় এ রীতি সেগুলোর বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে সাহয্য করছিল। কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দত্তক ভিত্তিক (মুখে ডাকা) আত্মীয়তার মধ্যে যতই পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করা হোক না কেন দত্তক মা, দত্তক বোন ও দত্তক কন্যা আসল মা, বোন ও কন্যার মতো হতে পারে না।

এসব কৃত্তিম আত্মীয়তার লোকাচার ভিত্তিক পবিত্রতার ওপর নির্ভর করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের মতো অবাধ মেলামেশা চলে তখন তা অনিষ্টকর ফলাফল সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এসব কারণে ইসলামের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন এবং যিনা হারাম হবার আইনের দাবি হচ্ছে এই যে, দত্তককে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করার ধারণাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে হবে।

কিন্তু এ ধারণাটি এমন পর্যায়ের নয় যে, শুধুমাত্র একটি আইনগত হুকুম হিসেবে এতটুকু কথা বলে দেয়া হলো যে, "দত্তক ভিত্তিক আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়" এবং তারপর তা খতম হয়ে যাবে। শত শত বছরের অন্ধ কুসংস্কার নিছক মুখের কথায় বদলে যাবে না। আইনগতভাবে যদি লোকেরা একথা মেনেও নিতো যে, এ আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়, তবুও পালক মা ও পালক পুত্রের মধ্যে, পালক ভাই ও পালক বোনের মধ্যে, পালক বাপ ও পালক মেয়ের মধ্যে এবং পালক শ্বশুর ও পালক পুত্রবধুর মধ্যে বিয়েকে লোকেরা মাকরূহই মনে করতো থাকতো। তাছাড়া তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাও কিছু না কিছু থেকে যেতো। তাই কার্যত এ রেওয়াজটি ভেঙে ফেলাই অপরিহার্য ছিল। আর এ ভেঙে ফেলার এ কাজটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতেই সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ যে কাজটি রসূল নিজে করেছেন এবং আল্লাহর হুকুমে করেছেন তার ব্যাপারে কোন মুসলমানের মনে কোন প্রকার অপছন্দনীয় হবার ধারনা থাকতে পারতো না। তাই আহযাব যুদ্ধের কিছু পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা করা হয় যে, তুমি নিজের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে নিজেই বিয়ে করে নাও। বনী কুরাইযাকে অবরোধ করার সময় তিনি এ হুকুমটি তামিল করেন। (সম্ভবত ইদ্দত খতম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাই ছিল বিলম্বের কারণ। আবার এ সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছিল।)

যয়নবকে বিয়ে করার ফলে তুমুল অপপ্রচার

এ বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে অকস্মাৎ ব্যাপক অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদি সবাই তাঁর ক্রমাগত বিজয়ে জ্বলে পুড়ে মরছিল। ওহোদের পরে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ পর্যন্ত দু'টি বছর ধরে যেভাবে তারা একের পর এক মার খেতে থেকেছে তার ফলে তাদের মনে আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। এখন প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করে আর কোন দিন তাঁকে হারাতে পারবে, ব্যাপারেও তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা এ বিয়ের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে এবং ধারনা করে যে, এবার আমরা মুহাম্মাদের (সা) শক্তি ও তাঁর সাফল্যের মূলে রয়েছে যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে খতম করে দিতে পারবো। কাজেই গল্প ফাঁদা হয়, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্রবধুকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। পুত্র এ প্রেমের কথা জানতে পেরে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। আর এরপর তিনি পুত্রবধুকে বিয়ে করে ফেলেন।

অথচ এটা ছিল একদম বাজে কথা। কারণ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী করীমের (সা) ফুফাত বোন। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হয় নবী করীমের (সা) সামনে। কোন এক সময় তাঁকে দেখে আসক্ত হবার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? তারপর রসূল (সা) নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁর বিবাহ দেন। কুরাইশ বংশের মতো সম্ভ্রান্ত গোত্রের একটি মেয়েকে একজন আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেবার ব্যাপারে কেউই রাজী ছিল না। হযরত যয়নব (রা) নিজেও এ বিয়েতে অখুশী ছিলেন। কিন্তু নবী করীমের (সা) হুকুমের সামনে সবাই হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এভাবে

তাঁরা সমগ্র আরবে এ মর্মে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, ইসলাম একজন আযাদকৃত গোলামকে, অভিজাত বংশীয় কুরাশীদের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সত্যিই যদি হযরত যয়নবের (রা) প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন আকর্ষণ থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) সাথে তাঁকে বিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরোধীরা এসব নিরেট সত্যের উপস্থিতিতেও এ প্রেমের গল্প ফেঁদে বসে। খুব রঙ চড়িয়ে এগুলো ছড়াতে থাকে। অপপ্রচারের অভিযান ক্রমে এত প্রবল হয় যে, তার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও তাদের তৈরি করা গল্প ছড়িয়ে পড়ে।

পর্দার প্রাথমিক বিধান

শত্রুদের এ মনগড়া কাহিনী যে মুসলমানদের মুখ দিয়েও রচিত হতে বাধেনি, এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সমাজে যৌনতার উপাদান সীমাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। সমাজ জীবনে এ নোংরামিটা যদি না থাকতো তাহলে এ ধরনের পাক-পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন ভিত্তিহীন, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মনগড়া কাহিনী মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কোথা সেদিকে কারো বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করাও সম্ভবপর হতো না। যে সংস্কারমূলক বিধানটিকে "হিজাব" (পর্দা) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এটি ছিল ইসলামী সমাজে তার প্রবর্তন করার সঠিক সময়। এ সূরা থেকেই এ সংস্কার কাজের সূচনা করা হয় এবং এক বছর পরে যখন হযরত আয়েশা (রা) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের কদর্য অভিযানটি চালানো হয় তখনই সূরা নূর নাযিল করে এ বিধানকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করা হয়। (আরও বেশী জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের ভূমিকা।)

রসূলের পারিবারিক জীবনের বিষয়াবলী

এ সময়ে আরও দু'টি বিষয় ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর সম্পর্ক ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনের সাথে কিন্তু যে সত্তা আল্লাহর দ্বীনকে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রাম-সাধনা করে চলছিলেন এবং নিজের সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এ মহৎ কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন তাঁর জন্য পারিবারিক জীবনে শান্তি লাভ, তাকে মানসিক অস্থিরতামুক্ত রাখা এবং মানুষের সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা ও স্বয়ং দ্বীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও জরুরী ছিল। তাই আল্লাহ নিজেই সারাসরি এ দু'টি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

প্রথম বিষয়টি ছিল, নবী (সা) চরম আর্থিক সঙ্কটে ভুগছিলেন। প্রথম চার বছর তো তাঁর অর্থোপার্জনের কোন উপায়-উপকরণ ছিল না। চতুর্থ হিজরীতে বনী নযিরকে দেশান্তর করার পর তাদের পরিত্যক্ত ভূমির একটি অংশকে আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু তাঁর পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এদিকে রিসালাতের দায়িত্ব ছিল এত বিরাট যে, তাঁর দেহ, মন ও মস্তিস্কের সমস্ত শক্তি এবং সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এ কাজে ব্যয়িত হবার দাবী জানাচ্ছিল। ফলে নিজের অর্থোপার্জনের জন্য সামান্যতম চিন্তা ও প্রচেষ্টা তিনি চালাতে পারতেন না। এ অবস্থায় তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আর্থিক অনটনের কারণে যখন তাঁর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতেন তখন তাঁর মনের ওপর দ্বিগুণ বোঝা চেপে বসতো।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল, হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করার আগে তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তাঁরা ছিলেনঃ হযরত সওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা) ও হযরত উম্মে সালামা (রা)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর ফলে বিরোধীরা এ আপত্তি উঠালো এবং মুসলমানদের মনেও এ

সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগলো যে, তাদের জন্য তো এক সঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা অবৈধ গণ্য করা হয়েছে কিন্তু নবী (সা) নিজে এ পঞ্চম স্ত্রী রাখলেন কেমন করে।

বিষয়বস্তু ও মুল বক্তব্য

সূরা আহযাব নাযিল হবার সময় এ সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে এবং এখানে এগুলোই আলোচিত হয়েছে।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং এর পটভূমি সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, এ সমগ্র সূরাটি একটি ভাষণ নয়। একই সময় একই সঙ্গে এটি নাযিল হয়নি। বরং এটি বিভিন্ন বিধান এবং ফরমান সম্বলিত। এগুলো সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রসঙ্গে একের পর এক নাযিল হয় তারপর সবগুলোকে একত্র করে একটি সূরার আকারে বিন্যাস্ত করা হয়। এর নিম্নলিখিত অংশগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

একঃ প্রথম রুকু'। আহযাব যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ রুকু'টি পড়লে পরিষ্কার অনুভূত হবে, এ অংশটি নাযিল হবার আগেই হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়ে ফেলেছিলেন। নবী (সা) দত্তক সম্পর্কিত জাহেলী যুগের ধারণা, কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে, লোকেরা "পালক" সম্পর্কে স্রেফ আবেগের ভিত্তিতে যে ধরনের স্পর্শকাতর ও কঠোর চিন্তাধারা পোষণ করে তা কোনক্রমেই খতম হয়ে যাবে না যতক্ষণ না তিনি নিজে (অর্থাৎ নবী) অগ্রবর্তী হয়ে এ রেওয়াজটি খতম করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারেই বড় সন্দিহান ছিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতেও ইতস্তত করছিলেন। কারণ যদি তিনি এ সময় যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টি করার জন্য পূর্বে যেসব মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকরা তৈরি হয়ে বসেছিল তারা এবার একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে। এ সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়।

দুইঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এ দু'টি রুকূ' যে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ দু'টি হয়ে যাবার পর নাযিল হয়েছে এটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তিনঃ চতুর্থ রুকূ' থেকে শুরু করে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তা দু'টি বিষয়বস্তু সম্বলিত।

প্রথম অংশে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে নোটিশ দিয়েছেন। এ অভাব অনটনের যুগে তাঁরা বেসবর হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা একদিকে দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাত এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নাও। যদি প্রথমটি তোমাদের কাঙ্খিত হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। তোমাদেরকে একদিনের জন্যও এ অনটনের মধ্যে রাখা হবে না বরং সানন্দে বিদায় দেয়া হবে।

আর যদি দ্বিতীয়টি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে সবর সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সহযোগিতা করো। পরবর্তী অংশগুলোতে এমন সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা মন-মগজের অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে সংস্কারের সূচনা করতে গিয়ে নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে

হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিহার করো। আত্মমর্যাদা নিয়ে গৃহে বসে থাকো। বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করো। এ ছিল পর্দার বিধানের সূচনা।

চারঃ ৪৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে হযরত যয়নবের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পর্কিত। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠানো হচ্ছিল এখানে সে সবের জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেগুলো সবই দূর করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে নবীর (সা) মর্যাদা কি তা জানানো হয়েছে এবং স্বয়ং নবীকে (সা) কাফের ও মুনাফিকদের মিথ্যা প্রচারণার মুখে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পাঁচঃ ৪৯ আয়াতে তালাকের আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত এসব ঘটনাবলী প্রসঙ্গে কোন সময় এটি নাযিল হয়ে থাকবে।

ছয়ঃ ৫০ থেকে ৫২ আয়াতে নবীর (সা) জন্য বিয়ের বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে নবীর (সা) ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

সাতঃ ৫৩--৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠানো হয়েছে। এগুলো নিম্নলিখিত বিধান সম্বলিতঃ

নবীর (সা) গৃহাভ্যন্তরে বেগানা পুরুষদের যাওয়া আসার ওপর বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত করা ও দাওয়াত দেবার নিয়ম-কানুন, নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এ আইন যে, গৃহাভ্যন্তরে কেবলমাত্র তাঁদের নিকটতম আত্মীয়রাই আসতে পারেন, বেগানা পুরুষদের যদি কিছু বলতে হয় বা কোন জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বলতে ও চাইতে হবে, নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের ব্যাপারে এ হুকুম যে, তাঁরা মুসলমানদের জন্য নিজেদের মায়ের মতো হারাম এবং নবীর (সা) পরও তাঁদের কারো সাথে কোন মুসলমানদের বিয়ে হতে পারে না।

আটঃ ৫৬ থেকে ৫৭ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে ও তাঁর পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই সঙ্গে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন শত্রুদের পরনিন্দা ও অন্যের ছিদ্রান্বেষণ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং নিজেদের নবীর উপর দরূদ পাঠ করে। এছাড়া এ উপদেশও দেয়া হয় যে, নবী তো অনেক কথা, ঈমানদারদের তো সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া ও দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকা উচিত।

নয়ঃ ৫৯ আয়াতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে সমগ্র মুসলিম নারী সমাজের যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

এরপর থেকে নিয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত গুজব ছড়ানোর অভিযানের (Whispering campaign) বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মুনাফিক, অকাটমূর্খ ও নিকৃষ্ট লোকেরা এ অভিযান চালাচ্ছিল।